বাংলার ধর্মধ্বজী বৃদ্ধা এবং তাদের চরিত্রকে আক্রমন করে তৎকালীন সমাজ, ব্যক্তি ও তাদের কদর্য চরিত্র ও নীতিভ্রষ্টতা কৌতুক ও ব্যঙ্গে বর্ননা করেছেন। প্রহসন দুটিতে তার যে আত্মাবিরন ক্ষমতা প্রকাশ পেয়েছে তার জন্য বাংলা নাট্যসাহিত্যে তিনি দীর্ঘজীবী হয়ে থাকবেন। মধুসূদনের প্রতিভা মূলত মহাকবি ও গীতিকবির প্রতিভা। তবু আধুনিক রীতির নাটকের প্রথম পথ নির্মান করে-ছেন মধুসূদন এবং এই নাট্য রচনাতে তিনি যে চমৎকার কৃতিত্বের পরিচয় রেখেছেন তা অনস্বীকার্য। নিঁখুতভাবে দেখলে তাঁর নাটকে কিছুকিছু ত্রুটি বিচ্যুতি ধরা যাবে। কিন্তু এটুকু বলা যেতেই পারে যে বাংলা নাটকের শুভসূচনা কিন্তু মধুসূদনের হাত দিয়েই হয়েছে। আর এজন্যই তিনি বাংলা নাটক ও নাট-কের ইতিহাসে পরম শ্রদ্ধায় অধিষ্ঠিত।

1st Sem BNGH-CC-T-2
Dr. Biswajit Podder

নাট্যকার মধুসূদন

বাংলা সাহিত্যে মধুসূদনের আবির্ভাব আকস্মিক এবং প্রথমে নাট্যকার রূপে। মাদ্রাজে অবস্থানকালে ইংরাজী Rizia নাটক রচনার মধ্যে দিয়ে তাঁর নাট্যসাহিত্যে প্রবেশ। 1858 সালে পাইকপাড়া জমিদার সিংহদের বেলগাছিয়া রঙ্গমঞ্চে রামনারায়ণ তর্করত্ন অনূদিত 'রত্নাবলী' অভিনয়ে আমন্ত্রিত হয়ে বাংলা নাটকের দৈন্যদশা প্রত্যক্ষ করে হতাশাগ্রস্থ হয়ে বাংলা নাটক রচনার সিদ্ধান্ত গ্রহন করেন। একে একে রচনা করেন -

পৌরাণিক -	1)	শর্মিষ্ঠা (1859)
	2)	পদ্মাবতী (1860)
ঐতিহাসিক	3)	কৃষ্ণকুমারী (1860)
রূপক	4)	মায়াকানন
	5)	বিষ না ধনুর্গুন (অসমাপ্ত)
প্রহসন	6)	একেই কি বলে সভ্যতা (1860)
	7)	বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ (1860)

মধুসূদনের 'শর্মিষ্ঠা' নাটকের কাহিনী মহাভারতের শর্মিষ্ঠা-দেবযানী-যযাতি গল্প হতে গৃহীত। 'শর্মিষ্ঠার নাম অনুসারে মাইকেল নাটকের নামকরন করিয়াছেন বটে, কিন্তু শর্মিষ্ঠার চরিত্র মোটেই সজীব হয় নাই'। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও বাস্তবতার দিক থেকে নাটকের নায়িকা দেবযানী চরিত্র অধিকতর জীবন্ত হয়েছে। দেবযানীর পাশাপাশি শুক্রাচার্য চরিত্রটি মাত্র ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। কাহিনীর কোথাও কোথাও কালিদাসের শকুন্তলার প্রত্যক্ষ প্রভাব দেখা যায়। আধুনিক নাটকের প্রথম সার্থক সূচনা দেখা গেলেও নাটকে কিছু ত্রুটি লক্ষনীয়। মধুসূদন নাটকে পাশ্চাত্য রীতি গ্রহনের পক্ষপাতী। পাশাপাশি তিনি সম্পূর্ন ভাবে সংস্কৃত রীতির প্রভাবমুক্ত হতে ব্যর্থ। নাটকের গতিবেগ আবেগদ্বারা মন্থর হয়েছে। সংঘাতের চেয়ে বিবৃতি এখানে বড়ো হয়ে দেখা দিয়েছে। অতিনাটকীয়তা ও যাত্রাধরনের বাগাড়ম্বরের ফলে এর অনেক জায়গায় নাটকীয় রস ক্ষুন্ন হয়েছে। নাটক প্রসঙ্গে রাজেন্দ্রলাল মিত্র লিখেছেন - 'তথাপি আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস আছে, যে সকল বাংলা নাটক এ পর্যন্ত প্রকাশিত হইয়াছে তন্মধ্যে সাধারন জনগনে 'শর্মিষ্ঠা'কে সর্বশ্রেষ্ঠ বলিবেন সন্দেহ নাই'।

মধুসূদন গ্রীক পুরানের প্রসিদ্ধ গল্প 'Apple of Discord' অবলম্বনে দেশীয় ছাঁচে পাশ্চাত্য গল্পকে খুব সাফল্যের সঙ্গে সংযোজন করেছেন। এ নাটকে শচী হয়েছেন জুনো, মুরলা-প্যালাস, রতি-ভিনাস, ইন্দ্রনীল-প্যারিস ও পদ্মাবতী হয়েছেন হেলেন। এখানেও নাট্যকার সংস্কৃত নাট্যপ্রভাবকে বর্জন করতে ব্যর্থ। আলঙ্কারিক বাক্‌রীতি ও নানা মুদ্রাদোষ এখানেও রয়ে গেছে। তবে কয়েকটি অমিত্রাক্ষর ছন্দ প্রয়োগ করে কাব্যে ছন্দোগত বিপ্লবের সূচনা করেছেন। রামগতি ন্যায়রত্নের মতে পদ্মাবতীর উপর শকুন্তলার স্পষ্ট প্রভাব বিদ্যমান। পদ্মাবতীর সঙ্গে ইন্দ্রনীলের মিলন ও বিচ্ছেদ এবং অবশেষে ঋষির আশ্রমে তাদের পুনর্মিলন সমস্ত ঘটনার উপর শকুন্তলার সাদৃশ্য বর্তমান। নাটক রচনা করতে জাতপ্রাপ্ত মধুসূদন উপলব্ধি করেন -

> 'No real improvement in the Bengali Drama could be expected until Blank Verse was introduced into it.'

১৮৬১ সালে মধুসূদনের শ্রেষ্ঠ নাটক 'কৃষ্ণকুমারী' প্রকাশিত। নাটকের কাহিনী কর্নেল টডের Annals & Antiquities of Rajasthan থেকে গৃহীত। এটি ঐতিহাসিক ট্র্যাজেডি হিসাবে প্রথম ও সার্থক। প্রসিদ্ধ গ্রীক নাট্যকার ইউরিপিদেস প্রণীত 'ইফিগেনিয়া এ্যাট তৌরিস' নাটকের কতকটা সাদৃশ্য আছে। উক্ত নাটকে রাজা আগামেমনন দেবী আর্টেমিসের রোষ শান্তির জন্য কন্যা ইফিগেনিয়াকে বলি দিয়েছিলেন। আমাদের 'কৃষ্ণকুমারী' নাটকে কতটা এই ঘটনার সাদৃশ্য আছে। জয়সিংহ ও মানসিংহ দুজনেই রানা কন্যা কৃষ্ণার পানিপ্রার্থী। যে কেউই না পেলে রাজ্য আক্রমণের সম্ভাবনা। একদিকের রাজ্য অন্যদিকে কন্যাকে রক্ষার তাগিদে রাজা দ্বিধাগ্রস্থ। কৃষ্ণা আত্মবিসর্জনের মাধ্যমে পিতাকে নিশ্চিন্ত করে গেলেন। এই ঘটনায় রানা ভীমসিংহ উন্মাদ হয়ে যান। মধুসূদন প্রথম দুই নাটকে যে কৃত্রিম কাব্য আধিক্যে নাটকের গতিকে মন্থর ও চরিত্রকে অসাধারণ করে তুলেছিলেন তা এখানে পরিহার করতে সমর্থ হয়েছেন। জগৎসিংহ- বিলাসবতী- মদনিকা- ধনদাসের কাহিনী উদয়পুরের সাথে সুসামঞ্জস্য পূর্ণ হয়ে উঠেছে। মদনিকা যে কারনে উদয়পুর প্রসাদে প্রবেশ করে যেভাবে মরুদেশীয় রাজাকে কাহিনী মাধ্যে নিয়ে এসেছেন তার বর্ননা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক; বিশ্বাসযোগ্য- কৌশলপূর্ন হয়েছে। কৃষ্ণকুমারীর চিত্রপট দেখিয়ে মানসিংহের প্রতি গভীর ভাবে অনুরক্ত হলেন এ ব্যাপার যদিও মধুসূদন রুক্মিনীর সঙ্গে তুলনা করে স্বাভাবিক বলতে চেয়েছেন তবু এরূপ প্রেম আমাদের মনের মধ্যে অবিশ্বাস ও সংশয় জন্মায়ে দেয়। নাটকটি ট্র্যাজেডি চেষ্টা হলেও পুরোপুরি বিশুদ্ধ ট্র্যাজেডি হয়নি। ভীমসিংহের অতিনাটকীয়তা ও কৃষ্ণার করুন-রসের লিরিকমূর্ছনা ট্র্যাজিকধর্মী নাটকে মানায়না। বিশুদ্ধ ট্র্যাজেডি না হলেও এটি নাটক হিসাবে সার্থক।

'কৃষ্ণকুমারী' নাটকের তের বছর পরে মধুসূদন 'মায়া-কানন' রচনা করেন। যে শোচনীয় দুর্গতি ও দুরবস্থার মধ্যে তিনি নাটকখানি রচনা করেছিলেন তা চিন্তা করলে ইহার দোষগুন আলোচনা করতে প্রবৃত্তি হয়না। 'শর্মিষ্ঠা' নাটকের দোষ এখানে পুনঃপ্রকট। সংস্কৃত অনুকৃতি, সংলাপের দীর্ঘতা, ভাবের কৃত্রিম আতিশয্য, কাব্যমিশ্রিত কারুন্যের একাধিপত্য মৃত্যুরোগজীর্ন হস্তের ক্লান্ত লেখনীতে পেয়েবসেছে। অজয়- ইন্দুমতীর প্রেম নিতান্ত কল্পনাচারী, উভয়ের মধ্যে গভীর প্রেমের দৃশ্য আমরা দেখিনি। শুধু মাত্র দর্শন ও শ্রবনেই এই প্রেমের উৎপত্তি ও অধিষ্ঠান। সেজন্য নাটকের বিলাপ ও খেদোক্তি কিছুটা কৃত্রিম মনে হয়। তাদের প্রেমে দুর্নিবার প্রতিবন্ধকতা নেই, আমরা মাত্র জানি দেবতারা তাদের মিলন চাননা, অজয়ের পিতা মাতার আত্মা ও গ্রহের প্রতিকূল। তাদের মিলন না হয়েও তাদের চরম ভাগ্য বিপর্যয় ঘটেছে। নাটকটিতে যথেষ্ট নাটকীয় সম্ভাবনা ছিল কিন্তু সংস্কৃত নাট্যরীতির প্রতি আনুগত্য ও দৈব নির্ভরতার জন্য ইহা ব্যর্থ হয়েছে।

মধুসূদন পাইকপাড়ার বিদ্যোৎসাহী জমিদার সিংহ ভ্রাতার অনুরোধে 'একেই কি বলে সভ্যতা' ও 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' (1860) প্রহসন দুটি রচনা করেছেন। প্রথমটিতে ইংরাজী শিক্ষিত ভ্রষ্টাচারী তরুন যুবকদের কদাচারকে শানিত রঙ্গব্যঙ্গের ভাষায় দারুন কশাঘাত করেছেন। দ্বিতীয়টিতে তথাকথিত প্রাচীন ব্রাহ্মন সমাজপতির কুচরিত্র ও লাম্পট্য খুব ভালভাবে বর্ননা করেছেন। প্রথমটিতে নাগরিক কলকাতার তরুন সমাজ এবং দ্বিতীয়টিতে গ্রাম্য